যায়যায়দিন

তারিখ 19 SEP 2008
পৃষ্ঠা - ৭ কলাম ১

পরীক্ষায় জিপিএ-৫ পাওয়া ও শিক্ষার মা

ড. এম সাইদুর রহমান খান

দেশের সাতটি শিক্ষা বোর্ডের ২০০৮ সালের এইচএসসি পরীক্ষার ফল ১০ সেপ্টেম্বর প্রকাশিত হয়েছে। এই ফলাফল এবার বাংলাদেশের ইতিহাসে কালের সব রেকর্ড ভঙ্গ করেছে। শুধু পাসের দিক দিয়েই নয়, এবার জিপিএ-৫ প্রাপ্তিতেও রেকর্ড সৃষ্টি হয়েছে। গ্রেডিং পদ্ধতিতে প্রণীত ফলাফলে এইচএসসির সাতটি সাধারণ বোর্ডের গড় পাসের হার ৬৫%। যা গত বছর ছিল ৬৪.২৭%। পাসের হারের সর্বোচ্চ সাফল্যের সঙ্গে জিপিএ-৫ প্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ১৯ হাজার ৩ জন, যা গতবারের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ। শিক্ষা উপদেষ্টা ড. হোসেন জিল্লুর রহমান পাসের এ হারকে জাতীয় প্রচেষ্টার সফল বায়ন বলে মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেন, ক্ষায় একটা সুস্থ পরিবেশ ফিরে এসেছে। ও নকলমুক্ত পরিবেশে এ বছর এইচএসসি ক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। তিনি আরো বলেন, ভাবকদের নিরলস প্রয়াস, বোর্ডগুলোর মনিটরিং ব্যবস্থা, শিক্ষা ালয়ের নেয়া বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে কদের প্রশিক্ষণ এবং সর্বোপরি শিক্ষার াত মানোন্নয়নে সবার আন্তরিক প্রচেষ্টার ণে পরীক্ষায় পাসের হার বৃদ্ধি পেয়েছে। বিগত বছরগুলোর এসএসসি ও এইচএসসি ক্ষার ফলাফল বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, ছাত্রীদের পাসের হার ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি য়ছে। এটা অবশ্যই আমাদের শিক্ষার ত্র একটি শুভ লক্ষণ। আশির দশকের ামাঝি থেকে নব্বই দশকের মাঝামাঝি সময়টি ছিল শিক্ষাক্ষেত্রে এক নৈরাজ্যকর স্থিতি। এসএসসি, এইচএসসি এমনকি া (পাস) পরীক্ষায় চলতো নকলের ৎসব। পরীক্ষা কেন্দ্রগুলো ছিল অভিভাবক নকল সরবরাহকারীদের অভয়ারণ্য। াবাজ পরীক্ষার্থীদের হাতে শিক্ষকরা ছিলেন । ডিগ্রি পরীক্ষার হলে তো বিশেষ বিশেষ সংগঠনের নেতাদের জন্য থাকতো বিশেষ ছা। দুঃখজনক হলেও সত্য এক শ্রেণীর ধু শিক্ষক এই অশুভ কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত তো। নকল সরবরাহকারীদের ঠেকাতে শের গুলিবর্ষণের ঘটনাও ঘটেছে। নকল ত গিয়ে শিক্ষক লাঞ্ছিত হওয়া ছিল বিক ঘটনা। যা হোক শেষপর্যন্ত সংশ্লিষ্ট র শুভ বুদ্ধির উদয় হয় এবং নব্বই দশকের র্ধ থেকেই শিক্ষা মন্ত্রণালয়, শিক্ষা বোর্ড, কলেজ কর্তৃপক্ষ এবং সর্বোপরি ভাবকদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় পরিস্থিতির ট ঘটতে থাকে। নকলমুক্ত পরিবেশে ক্ষা দেয়ার পরিস্থিতি ধীরে ধীরে গড়ে ত থাকে। তবে এটা কিন্তু হঠাৎ একদিন হয়নি, ধারাবাহিকভাবে ক্রমান্বয়ে তা ছে। ফলে বিশেষ কোনো দল বা ব্যক্তি এ তের দাবিদার নয়। সংশ্লিষ্ট সবার সম্মিলিত ষ্টায়ই তা সম্ভব হয়েছে।

ক্ষ্য করলে দেখা যাবে, বিগত বছরগুলোয় ার হার বৃদ্ধির একটা সামঞ্জস্যপূর্ণ াহিকতা ছিল। যেমন ২০০৫ সালে ছিল ৭%; ২০০৬ সালে ছিল ৬২.৫৭% এবং ৭ সালে ছিল ৬৪.২৭%। লক্ষ্যণীয় যে, হঠাৎ করে পাসের হার গতবারের চেয়ে বৃদ্ধি এবং একইসঙ্গে জিপিএ-৫ পাওয়ার া গতবারের তুলনায় দ্বিগুণ হওয়ার টি খুব স্বাভাবিক ব্যাপার বলে মনে হয় পাসের হার বৃদ্ধিতে শিক্ষা উপদেষ্টা ই আত্মতৃপ্তি লাভ করুন না কেন, প্রশ্ন গত এক বছরে শিক্ষাক্ষেত্রে এমনকি বিক ঘটনার সৃষ্টি হয়েছিল? ফলাফল া হওয়া আর ভালো দেখানো কিন্তু এক তাছাড়া পাসের হার বৃদ্ধি শিক্ষার মানোন্নয়নের সঠিক মাপকাঠি নয়। কেবল সংখ্যা ও পরিমাণগত দিক থেকে ফলাফল বিচার করলে চলবে না, গুণগত মানের দিকটি আগে দেখতে হবে। ফলাফলে পাসের যে রেকর্ডের কথা বলা হচ্ছে, শিক্ষার্থীদের অর্জিত জ্ঞান সেই পরিমাণ রেকর্ড ছুঁয়েছে কী?

তবে হ্যাঁ একথা ঠিক যে নতুন প্রজন্মের ছেলে মেয়েদের মধ্যে সাধারণভাবে জানা ও শেখার আগ্রহ বাড়ছে। এটা মূলত দুটি কারণে। প্রথমত, অভিভাবকদের সচেতনতা আগের চেয়ে বৃদ্ধি পাওয়ায় তারা সাধ্যানুযায়ী ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার প্রতি বেশি নজর দিচ্ছেন। দ্বিতীয়ত, আধুনিক প্রযুক্তির সম্প্রসারণের কারণে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার প্রতি শিক্ষার্থীদের আগ্রহ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এছাড়া শহরের নামিদামি কিছু স্কুলের (যেমন নডর ডেম, ভিকারুন-নিসা-নূন, আইডিয়াল স্কুল ও কলেজ, হলিক্রস কলেজ, উত্তরা মডেল স্কুল ও কলেজ ইত্যাদি) শিক্ষকদের আন্তরিকতা ও দায়িত্বশীলতাও ছাত্রছাত্রীদের মেধার মান উন্নয়নে সহায়ক হয়েছে বলে ধারণা করা হয়। সে কারণেই দেখা যাচ্ছে প্রতিবছর হাতেগোনা ওইসব স্কুল ও কলেজই পাসের হার ও জিপিএ-৫ পাওয়ার দিক থেকে সেরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে বেরিয়ে আসছে। পাশাপাশি অধিকাংশ ছাত্রছাত্রী গ্রামে-গঞ্জের বিভিন্ন এলাকায় যেসব স্কুল-কলেজে পড়াশোনা করে তাদের শিক্ষার মান কিন্তু মোটেই সন্তোষজনক নয়। শিক্ষক স্বল্পতা, শিক্ষা উপকরণ ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের অভাবের কারণে ওইসব স্কুলে প্রত্যাশিত পাঠদান সম্ভব হয় না। ফলে শিক্ষার্থীরা ভালো ফলাফল লাভের আশায় প্রাইভেট পড়ার দিকে ঝুঁকে পড়ছে। অভিভাবকদের সামর্থ্য না থাকলেও পরিস্থিতির কারণে বাধ্য হচ্ছেন ছেলেমেয়েদের প্রাইভেট টিউটরের কাছে পাঠাতে। আর এক শ্রেণীর ফাঁকিবাজ আদর্শ বিবর্জিত শিক্ষক প্রাইভেট পড়ানোকে বাণিজ্যিক দৃষ্টিকোণ থেকেই বিবেচনা করে থাকেন। শিক্ষকদের মধ্যে যারা অধিকতর যোগ্য ও অভিজ্ঞ তাদের বাসায় স্কুল-কলেজের মতো ছাত্রছাত্রীদের ভিড় থাকে সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত। ছাত্রছাত্রীদের দৌড়াদৌড়ি, ছুটোছুটির শেষ নেই। ঘুম থেকে উঠেই স্কুলে যাওয়ার আগেই এক শিক্ষকের বাসায় এবং স্কুল থেকে ফিরে বিকালে বা সন্ধ্যায় আরেকজনের বাসায়। নিজের বাসায় পড়ার টেবিলে বসার সময় খুব কমই থাকে। এক শ্রেণীর অসাধু শিক্ষক নামধারী ব্যক্তি ছাত্রছাত্রীদের বাধ্য করে তাদের কাছে প্রাইভেট পড়তে। স্কুল-কলেজে যদি ঠিকমতো ক্লাস হতো, যথাসময়ে কোর্স সম্পন্ন হতো, শিক্ষকরা যদি নিষ্ঠাবান হতেন তবে প্রাইভেট পড়ার দরকার হতো না।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, এসব আদর্শহীন বাণিজ্যিক মনোভাবাপন্ন শিক্ষকরা ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার্থীর পরিবর্তে পরীক্ষার্থী হিসেবে গড়ে তুলছেন। অর্থাৎ প্রকৃত জ্ঞান অর্জন ও চর্চার পরিবর্তে কী উপায়ে পরীক্ষায় ভালো ফলাফল করা যাবে সেভাবেই তাদের প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকেন। প্রশ্নের ধারাও পরিবর্তন করা হয়েছে। কতোটুকু প্রশ্নের কতোটুকু উত্তর তা নোট আকারে ছাত্রছাত্রীদের সরবরাহ করা হয়। প্রশ্নটা একটু ঘুরিয়ে করলেই পরীক্ষার্থী তার উত্তর দিতে পারে না। কারণ নোট যেভাবে করা আছে তার বাইরে যাওয়ার ক্ষমতা তাদের নেই। যাকে বলে Spoon Feeding। একেবারে রোবটের মতো প্রশ্নের উত্তর শেখানো হয়। যেহেতু অধিকাংশ ছাত্রছাত্রী টেক্সট বই পড়ে না, তাই প্রশ্ন একটু বাঁকা হলেই আর তার উত্তর মেলে না। আর যদি মুখস্থ করা নোট অনুযায়ী প্রশ্ন আসে তখন তো একেবারে পোয়াবারো, জিপিএ-৫ অবধারিত। সুতরাং জিপিএ-৫ পেলেই যে সে মেধাবী ছাত্র তা কোনো সহজ সরল সমীকরণের মাধ্যমে প্রমাণ করা যাবে না।

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে যাদের আমরা ইনপুট হিসেবে প্রথম বর্ষ সম্মান শ্রেণীতে ভর্তি করি তাদের সাধারণ মেধাবী ছাত্র হি ধরে নেয়া হয়। কারণ রীতিমতো ভর্তি মাধ্যমে তারা সীমিত আসনে তাদে নিশ্চিত করে থাকে। এ ব্যাপারে আমি নিজ বিভাগে দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা করতে চাই। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুসরে ছাত্রছাত্রীদের সবচেয়ে প বিষয়ের একটি হলো ফলিত পদার্থ বি ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং। ফলে ভর্তি প্রতিদ্বন্দ্বিতাও হয় তীব্র। গড়ে এখানে আসনের বিপরীতে ভর্তি পরীক্ষায় অং প্রায় ১২৫ জন ছাত্রছাত্রী। এসএস এইচএসসির ফলাফলের সঙ্গে ভর্তি প প্রাপ্ত নম্বর যোগ করে মেধা তালিকা তৈ হয়, তাতে মেধাই হয়ে ওঠে বাছাইয়ের উপাদান। কাজেই যাদের ভর্তি প মাধ্যমে ভর্তি করা হয় তারা যে ওই স্টার মার্কস (আগেকার পদ্ধতিতে) জিপিএ-৫ বা কাছাকাছি গ্রেড মার্ক তাতে কোনো সন্দেহ নেই। মো অপেক্ষাকৃত মেধাবীদেরই ভর্তি করা হ প্রায় এক দশক ধরে আমি প্রথম বর্ষ শ্রেণীতে ইলেকট্রনিকসের একটি কোর্স আসছি। নানাভাবে আমি ক্লাসে তাদে যাচাইয়ের চেষ্টা করি। এছাড়া তিনটি টেস্ট ও বর্ষ ফাইনাল পরীক্ষা তো আ সত্যি কথা বলতে কি আমি পারফরমেন্সে (দু'চারজন বাদে) মোটেই নই। আগেই উল্লেখ করেছি এদের অধি জিপিএ-৫ বা স্টার মার্কস পাওয়া ইংরেজিতে ৮০% মার্কস পাওয়া ছাত্র আছে, যাদের অধিকাংশ শুদ্ধভাবে প্যারাগ্রাফ লিখতে পারে না। আমার সহকর্মীদের অভিজ্ঞতাও একই অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সবচেয়ে পা বিষয়ে ভর্তিকৃত ছাত্রছাত্রীদের পারফরমে এমন হতাশাব্যঞ্জক হয় তবে বিষয়ের অবস্থাও যে তথৈবচ তা অনুমেয়।

কাজেই জিপিএ-৫ পাওয়াতে সাধার শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও শিক্ষকের মা উচ্ছ্বাস ও উল্লাস এবং শিক্ষা উপ আত্মতৃপ্তি এগুলো এক বিষয়, আর শিক্ষ উন্নয়ন অন্য বিষয়। আমাদের সম্ভাবনাময় ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষার্থী হিসে প্রকৃত শিক্ষার্থী হিসেবে গড়ে তুলতে অবশ্যই আমাদের প্রচলিত শিক্ষা প আমূল পরিবর্তন করতে হবে। এ শিক্ষা মন্ত্রণালয়, শিক্ষা বোর্ড এবং স শিক্ষক মণ্ডলীকে গভীরভাবে অনুধাবন হবে এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হ পাসের হার বৃদ্ধি এবং জিপিএ-৫-এর বৃদ্ধিই শিক্ষার মান নির্ণয় করে না। আ তরুণ শিক্ষার্থীদের মেধা সম্পর্কে কি বোঝাবুঝির কোনো অবকাশ নেই, শুধু শিক্ষা ব্যবস্থা তাদের জ্ঞানার্জন ও বিকাশের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ি নকলমুক্ত পরিবেশে পরীক্ষা হচ্ছে এটা ভালো লক্ষণ এবং সংশ্লিষ্ট সবাই জাতির ধন্যবাদ পাওয়ার দাবিদার। কিন্তু জাতিকে উন্নত হতে হলে শিক্ষার মা অপরিহার্য। কারণ বর্তমান বিশ্বায়নের এসব উজ্জ্বল সম্ভাবনাময়ী তরুণ তরু দেশে-বিদেশে প্রতিযোগিতার নিজেকে স্থান করে নিতে হবে। জিপিএ-৫ পাওয়াই মূল লক্ষ্য নয়- পরিধির বিস্তৃতি ঘটানোই হোক দৃঢ়প্রত্যয়।

ড. এম সাইদুর রহমান খান: কলাম লে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচ

> কাজেই জিপিএ-৫ পাওয়াতে সাধারণভাবে শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও শিক্ষকের মাঝে যে উচ্ছ্বাস ও উল্লাস এবং শিক্ষা উপদেষ্টার আত্মতৃপ্তি এগুলো এক বিষয়, আর শিক্ষার মান উন্নয়ন অন্য বিষয়। আমাদের অমিত সম্ভাবনাময় ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষার্থী হিসেবে নয় প্রকৃত শিক্ষার্থী হিসেবে গড়ে তুলতে হলে অবশ্যই আমাদের প্রচলিত শিক্ষা পদ্ধতির আমূল পরিবর্তন করতে হবে। এ বিষয়টি শিক্ষা মন্ত্রণালয়, শিক্ষা বোর্ড এবং সম্মানিত শিক্ষক মণ্ডলীকে গভীরভাবে অনুধাবন করতে হবে এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে। শুধু পাসের হার বৃদ্ধি এবং জিপিএ-৫-এর সংখ্যা বৃদ্ধিই শিক্ষার মান নির্ণয় করে না। আমাদের তরুণ শিক্ষার্থীদের মেধা সম্পর্কে কিন্তু ভুল বোঝাবুঝির কোনো অবকাশ নেই, শুধু ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থা তাদের জ্ঞানার্জন ও মেধা বিকাশের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে।